গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৪ এপ্রিল ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

৩০ মার্চ কলকাতায় যুদ্ধবিরোধী মানুষের বিশাল

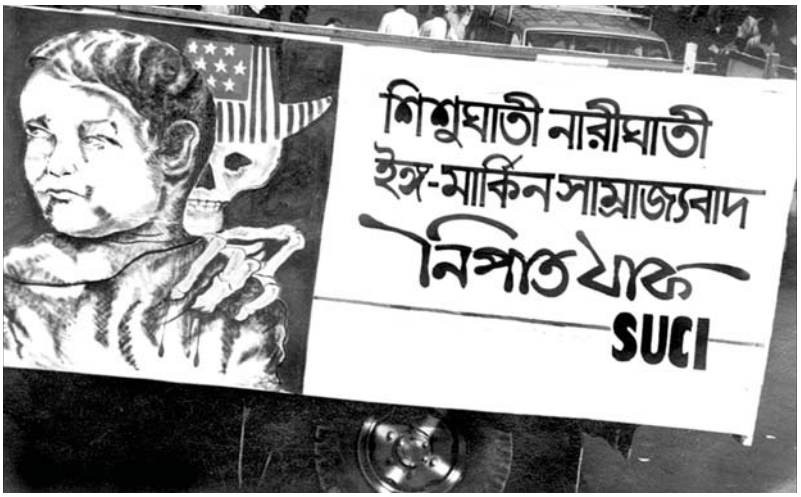

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন
বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক দলের প্রতি এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

(বিভিন্ন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বের কাছে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ২৬ মার্চ নিম্নের চিঠি পাঠিয়েছেন।ঃ

প্রিয় কমরেড,

আন্তর্জাতিক সমস্ত রীতিনীতি ও প্রথা লঙ্ঘন করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও বিশ্বজনমতের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী জোট ইরাকের বিরুদ্ধে যে চূড়ান্ত অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে, তাতে আমাদের মতো আপনিও নিশ্চয়ই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাকের সামরিক ক্ষেত্র এবং অসামরিক জনসাধারণ উভয়ের উপরই নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করছে এবং যাবতীয় গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করছে যা ইতিমধ্যেই অগণিত পুরুষ, নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং বহু শহর, নগর, গ্রাম ও তেলখনিকে ধ্বংস করেছে। সকল অংশের জনগণেরই এই ঘৃণ্য আক্রমণকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করা উচিত। অথচ, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার ও দুনিয়াব্যাপী শান্তিকামী জনগণ যখন এই বর্বর আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করেছে তখন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার এরকম একটি অন্যায় যুদ্ধ ও বর্বরতাকে নিন্দা করতেও অস্বীকার করেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়তার সাথে মনে করে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের

সাতের পাতায় দেখুন

ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের ছবি ও খবর ৫ পাতায়

বর্ধমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের অবস্থান

ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরাম — বর্ধমান শাখার উদ্যোগে ২৩ মার্চ শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং দিবসে বর্ধমান স্টেশন মোড়ে এক প্রতিবাদ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষক, যুবক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বহু সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এই অবস্থানে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মানস ব্যানার্জী, ছাত্রী ঝর্ণা পাল ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে প্রাণবল্লভ সরকার। সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের (পশ্চিমবঙ্গ) পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত। অবস্থানে জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

ত্রিপুরায় যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে ত্রিপুরা রাজ্যে এস ইউ সি আই আগরতলা সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে একটি সুসজ্জিত মিছিল ২১ মার্চ বিকাল ৫টায় কর্ণেল চৌমুহনী থেকে শুরু হয়ে শঙ্কর চৌমুহনী, ফায়ার ব্রিগেড, বটতলা হয়ে কামান চৌমুহনীতে যায়। সেখানে একটি যুদ্ধ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড শিবানী দাস, সুব্রত চক্রবর্তী ও বাবুল বণিক। তাঁরা বলেন, আজ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে আমেরিকা ও ব্রিটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী খবরদারী সম্ভব হচ্ছে।

বক্তাগণ এর বিরুদ্ধে দুর্বার শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। সভাশেষে জর্জ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বিদ্যুতের অ্যাডিশনাল চার্জ

মেদিনীপুরে প্রবল বিক্ষোভ

২১ মার্চ সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে জোনাল ম্যানেজারের অফিসে উপস্থিত হয়ে দেখেন বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ) কিছু সদস্য অফিসের গেট ঘিরে রেখে অবস্থান করছেন। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাউকে ডেপুটেশনে যেতে দেবেন না বলে তাঁরা মাইকে হুঙ্কার দিতে থাকেন। এই ঘটনায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রবল বিক্ষোভের চাপে জোনাল ম্যানেজার ডেপুটেশনের প্রতিনিধিদের অফিসে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ডেপুটেশনে যান সংগঠনের জেলা সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দাস, সম্পাদক মধুসূদন মান্না, অফিস সম্পাদক অমল মাইতি সহ পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিরা জেড্ এম-কে বলেন, অযৌক্তিক অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ না দেওয়ায় যদি কোন গ্রাহকের লাইন কাটার চেষ্টা হয় প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভ

গত ১৩ মার্চ পূর্বমেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরের এস আর এস এস অফিসে তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক তাদের দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দিতে যান, কিন্তু এস এস অফিসে না থাকায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঐ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২০ মার্চ কোচবিহার শহরে এস ইউ সি আই-এর যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

স্বনিযুক্তি ঃ জেলা কনভেনশন

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পূর্বমেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে ২১ মার্চ তমলুক ব্রাইট ফিউচার হলে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অভয় কুমার মাইতি। শুরুতে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে যুদ্ধ বিরোধী একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ দাস। বিভিন্ন ব্লক কমিটির সদস্যরা বলেন কেন্দ্র রাজ্য সরকার শিক্ষিত বেকারদের চাকরি দিতে না পেরে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নামে ব্যাঙ্ক ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে দিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে। এই প্রতারণার প্রতিবাদে এবং বেকারদের বাঁচার মত কাজ বা উপযুক্ত বেকার ভাতার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বাঁচার বিকল্প পথ নেই। কনভেনশনে জেলা সম্পাদক দেবকীদুলাল রায়, সহসভাপতি মানিক মাইতি, সুধীর মাইতি, প্রদীপ জানা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে ব্লকস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত অবস্থান ডেপুটেশন ঘেরাও-এর কর্মসূচি গৃহীত হয়।

সুকোমল দাশগুপ্ত সুস্থ হয়ে উঠছেন

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত এখন বিপলমুক্ত। ৫ মার্চ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি কলকাতা হার্ট ক্লিনিক এ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি হন ও পরে তাঁকে 'সুরক্ষা' ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনি কলকাতা হার্ট ক্লিনিক এ্যান্ড হসপিটালে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

বহরমপুরে

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মশালা

অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটি মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ মার্চ বহরমপুর ঋত্বিক সদনে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক 'কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। কর্মশালায় রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সাহিত্যিক গীতেশ শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা কেশোয়ার জাঁহা ও রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি তপন রায়চৌধুরী।

সভার শুরুতে জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা খাদিজা বানু কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিনিধিরা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং আলোচনা করেন। গীতেশ শর্মা তার বক্তব্যে মানব সমাজের বিশেষ সময়ে ধর্ম ও ধর্মকে কেন্দ্র করে হিংসা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি এবং বর্তমান সময়ে তার রূপ নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। সমাজসেবিকা কেশোয়ার জাঁহা তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করেন। এমনকি নদীয়ার ধানতলার নারী লাঞ্ছনার ঘটনাটিকে এ রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে আবৃত করতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচক স্বপন ঘোষাল বলেন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতার মধ্যেই বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপাদান ছিল। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন দিয়েছে এবং এই পথেই এদেশে সংখ্যাগুরু আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার উত্থান সম্ভব হয়েছে।

সভার সঞ্চালক ও রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তপন রায়চৌধুরী তার বক্তব্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে কিভাবে ইতিহাস এবং শিক্ষাকে বিকৃত করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন এবং সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এই সমস্যা মোকাবিলায় গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। এছাড়া বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এ হাসান, ফাদার টনি, ফাদার বিশ্বরূপ বাদল ঘোষ, অধ্যক্ষ সনৎ কর, সামাজিক আন্দোলনের নেতা শিবু সান্যাল আলোচনা করেন। অধ্যাপক আবুল হাসনাৎ, সাংবাদিক হাতেমুল ইসলাম, আইনজীবী জালেপ হোসেন প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

ভগৎ সিং শহীদ দিবসে সাইকেল মিছিল

ব্যারাকপুর মহকুমা "শহীদ ভগৎ সিং স্মরণ কমিটি"র উদ্যোগে ২৩ মার্চ শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ৭২তম আত্মবলিদান দিবসে কাঁচড়াপাড়া সার্কাস ময়দান থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত একটি সাইকেল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত একটি অনুষ্ঠানে কমিটির সভানেত্রী সুজাতা রায় বলেন, আজ যখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট অত্যন্ত নগ্নভাবে ইরাক আক্রমণ করেছে, তখন ভগৎ সিং-এর আদর্শে আমাদের সামনে আশু কর্তব্য হচ্ছে মানবসভ্যতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা। দুপুর ১১টা নাগাদ শ্যামনগর পোষ্ট অফিস মোড়ে সাইকেল মিছিল শেষ হয়। সেখানে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত সভা হয়। বক্তব্য রাখেন অমল চক্রবর্তী। কমিটি একমাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

আসুন, সকলে মিলে অতীতের মতো এদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পরিবেশ গড়ে তুলি

যুদ্ধ বিরোধী কনভেনশনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি বাম ও গণতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০ মার্চ মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী জোট ইরাকে হামলা শুরু করার পরই কলকাতায় ২১ মার্চ রানি রাসমণি রোড থেকে একটি যুক্ত মিছিল মার্কিন প্রচার দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

২৫ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে আহূত হয়েছিল একটি যুদ্ধ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন। কনভেনশনের মূল ঘোষণাপত্র পেশ করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আমেরিকার ছাত্রী র‍্যাচেল কোরির হত্যার ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানায় ২৪ জন নিরীহ নাগরিকের বর্বর হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয় কনভেনশনে। অপর এক প্রস্তাবে ভারত সরকারের তথাকথিত 'মধ্যপন্থা'র ও রাষ্ট্রসংঘের নীরব নিষ্ক্রিয় ভূমিকার নিন্দা করা হয়।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রভাস ঘোষ, সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা জয়ন্ত রায়, আর এস পি রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সি পি আই নেতা সত্য ভট্টাচার্য, প্রদীপ ব্যানার্জী (সি পি আই এম এল ইউ আই), সুব্রত বসু (সি ও আই এম এল), শ্যামল ভট্টাচার্য (জনতা দল), প্রবোধ সিন্‌হা (ডি এস পি), অরুণ মাঝি (আর জে ডি), প্রতীম চ্যাটার্জী (এম এফ বি), অসীম চ্যাটার্জী (সি আর এল আই), মণি পাল (এস পি), মানিক দত্ত (ওয়ার্কার্স পার্টি), মিহির বাইন (আর সি পি আই), সন্তোষ রাণা (সি পি আই এম এল), সাধন কর (বি বি সি) এবং কালিপদ ঘোষ (বলশেভিক পার্টি)।

কনভেনশনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আক্রমণকারী মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের প্রতি ধিক্কার ও ইরাকের সংগ্রামী জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

বহুদিন আগে মহান লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ মানেই অপর দেশ আক্রমণ, দখল ও লুণ্ঠন। এটা বারবারই দেখা গেছে, আজ ইরাকেও তাই দেখছি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে গিয়ে একদল বুদ্ধি ভ্রষ্ট বুদ্ধি জীবী প্রচার করতেন, 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন দেশ গণতন্ত্রের পূজারী, মুক্ত দুনিয়ার ত্রাতা।' আজ তাঁরা দেখুন সেই দেশ কিভাবে একটি ছোট্ট দেশের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করছে। যদি ইউ এন ও তার তল্পিবাহক হয়, সে ইউ এন ও-র ঝাণ্ডা ওড়ায়, না হলে ইউ এন ও-এর মতামতকে তোয়াক্কা করে না; সে-ই আজ যেন দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বুর্জোয়ারা প্রচার করেছিল, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, বিশ্বের এই দুই ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের জন্যই যুদ্ধ হবে। লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে মহান স্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন, এটা ভ্রান্ত চিন্তা, যুদ্ধের মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরেই রয়েছে। আজ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা নেই, তাহলেও এই যে আক্রমণ হচ্ছে, এটা স্ট্যালিনের বক্তব্যকেই সঠিক প্রমাণ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র ইউরোপ যখন মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে ডলারের পায়ের তলায়, তখনও স্ট্যালিন বলেছিলেন, এটা বেশিদিন থাকবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থেই মাথা তুলবে। আজ ইরাক যুদ্ধ নিয়ে ফ্রান্স-জার্মানি ও অন্যদের বিরোধিতাও তাই প্রমাণ করছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যেসব ভক্তরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনে উল্লসিত হয়েছিল, তারা ভেবে দেখুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ থাকলে এবং লেনিন-স্ট্যালিনের বৈপ্লবিক লাইনে দাঁড়ালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি ইরাকে এই আক্রমণ চালাতে পারত? মিশর সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণ করার পর মার্কিন মদতে ইঙ্গ-ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদ যখন মিশর আক্রমণ করেছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক থ্রেটেই তারা আক্রমণ থামাতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্কিন দস্যুরা শুধু তেল লুণ্ঠন করে ব্যবসা করার জন্যই আক্রমণে যায় নি, তারা তেলের ভাণ্ডার কণ্ট্রোল করে দুনিয়ার অর্থনীতির উপরই পুরো কণ্ট্রোল আনতে চাইছে। এছাড়া তার নিজের অর্থনীতিই আজ ডুবছে, নিজেরাই বলছে এটা বাব্‌ল্ ইকনমি (bubble economy), একে চাঙ্গা করতে হলে ওয়ার ইণ্ডাস্ট্রিকে চাঙ্গা করতে হবে, তাই যুদ্ধ প্রয়োজন। যে কারণে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে কিসিঙ্গার বলেছিল, 'Peace in Vietnam is war in U.S. economy.' আমেরিকার প্রয়োজন, প্রথমত, ইরাককে ধ্বংস করে আরব দেশগুলির জাতীয়তাবাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া ; দ্বিতীয়ত, বিশ্বজুড়ে আরও আধিপত্য ও হুকুমের রাজত্বের বিস্তার ঘটানো ; তৃতীয়ত, নিজের দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ জনগণ যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালাচ্ছে, তাদের দৃষ্টিকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া ও চতুর্থত, উগ্র মার্কিন জাতীয়তাবাদ ও ক্রিশ্চিয়ান সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলা। তাই আমেরিকা প্রচার করছে এ লড়াই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইরাকের জনগণের লড়াই নয়, এ যেন ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মের লড়াই। এই ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ লক্ষ খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী জনগণ, যারা মার্কিন-ব্রিটিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে।

আমরা জানি, সঙ্কটের হাত থেকে বাঁচার জন্যই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বাধায়, কিন্তু যুদ্ধ তাদের সঙ্কটকে আরো তীব্র করে। আমরা বিশ্বাস করি, শেষ পর্যন্ত ইরাকের জনগণের জয় হবেই। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের দেশের ভিতরে ও অন্যান্য দেশে যে প্রবল প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে তা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে।

এটা লক্ষ্য করা দরকার, ভারতের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরেই ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে দোস্তি করে চলেছে। ভারতের পুঁজিপতিদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার সুপার পাওয়ার হিসাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, মার্কিন সাহায্য নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার লুণ্ঠন করা। ইতিমধ্যেই ত' মার্কিন রাষ্ট্রদূত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে ভারতকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার টোপ দিয়েছে। এ সব কারণেই ভারত সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের এই আক্রমণের প্রতিবাদ করছে না। এটা খুবই নিন্দনীয় এবং এই দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের অপমান। তারা বলছে মধ্যপন্থা। যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ইরাকী জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে কোনও মধ্যপন্থা থাকতে পারে কি? আসলে মধ্যপন্থা নয়, তারা পরোক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তোষণ করেই চলছে।

কিন্তু ভারত সরকার এই সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতি নিতে সাহস করলো কি করে? এই দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। ৪০-এর দশক, ৫০ ও ৬০ এর দশকে এই দেশে যে গণআন্দোলনের জোয়ার ছিল, শ্রেণীসংগ্রাম ছিল, প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ছিল, তা আজ কোথায়? এই দেশের বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র হচ্ছে গণআন্দোলন নয়, শ্রেণীসংগ্রাম নয়, রাজনীতি চলবে শুধু ভোটের জন্য, মন্ত্রীত্বের জন্যই, আর চলবে ধর্মভিত্তিক গণহত্যাকাণ্ড। আজ তাই চলছে। বামপন্থীদের এই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে, আবার গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে, তার ধারাবাহিকতাতেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম জোরদার করতে হবে, ভারত সরকারকেও পলিসি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে হবে।

পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কী প্রবল আন্দোলনের জোয়ার বইছে। অথচ এই দেশগুলির নৈতিক অধঃপতন নিয়ে একসময় আমরা কত উদ্বেগ প্রকাশ করতাম। আজ তারা মাথা তুলে দাঁড়ালো কি করে? শুরু হয়েছিল অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়েই। গ্লোবালাইজেশান, ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস, বেকারদের চাকুরি, শিক্ষা সংকোচন, এইসব প্রশ্নে বিশাল বিশাল বিক্ষোভ-সমাবেশ-মিছিল হয়েছে, লড়াইয়ের মানসিকতা জেগেছে, তারই পথ বেয়েই এই যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইরাকের জনগণ একা লড়ছে না, তাদের পাশে আছে খোদ মার্কিন দেশ ও ব্রিটেনের জনগণ — সমগ্র বিশ্বের জনগণ।

বিগত শতাব্দী শুরু হয়েছিল রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এরপর এসেছে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়যাত্রা। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে নেমে এল গভীর অন্ধকার, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার ফলে। আবার এই শতাব্দীর সূচনায় আমরা নূতন আশার আলো দেখছি। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-আন্দোলন প্রবলভাবে মাথা তুলছে, পশ্চিমী দুনিয়াতেই ঝড় উঠছে। শ্লোগান উঠছে গ্লোবালাইজেশন দূর হঠো, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। অনিবার্যভাবেই এর পরের শ্লোগান কী আসবে? সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ।

এই মঞ্চে যাঁরা উপবিষ্ট আছেন, দলীয় ব্যানার যার যাই হোক, মতপার্থক্য যাই থাকুক, তাঁরা প্রায় সকলেই কৈশোরে-যৌবনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার আবেদন — আসুন সকলে মিলে এই দেশে অতীতের মতো গণআন্দোলনের পরিবেশ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পরিবেশ গড়ে তুলি।

৩০ মার্চ দুপুরে কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভে হিংস্র ঈগলরূপী বুশের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করছেন সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়

সম্প্রতি গোটা দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে যেভাবে বিতর্ক তোলা হয়েছে এবং ক্রমে তা ভারত বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে উঠছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে একদিন যা হিন্দু উদ্বাস্তু হিসাবে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং জীবনের অনিশ্চয়তার পরিণামে তা অব্যাহত থেকেছে। বাংলাদেশের একেবারে হতদরিদ্র নিরুপায় মানুষ বাঁচার তাগিদে, শুধু প্রতিবেশী ও আয়তনে বিশাল ও অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনীতির দেশ ভারতেই ঢুকছে না, একইভাবে জীবন জীবিকার তাগিদে চলে যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। যারা এদেশে আসছে তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই আছে। আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি এদের শুধুমাত্র মুসলমান বলে দেখানোর যে চেষ্টা করছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

বাংলাদেশ থেকে এই অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি হঠাৎ অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এর মধ্যে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। দুঃখের বিষয় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখেও একই সুর শোনা যাচ্ছে। তাঁরা সকলেই একমত যে, অনুপ্রবেশ শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করছে না, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি করছে এবং অনুপ্রবেশকারীদের অনেকেই পাকিস্তানি গোয়েন্দা চক্র আই এস আই-এর এজেন্ট এবং সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, অবৈধভাবে প্রবেশ করা সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিককে ফেরত পাঠানোর অভিযান অব্যাহত থাকবে। উপপ্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। কিন্তু উপপ্রধানমন্ত্রীর দু কোটিই হোক, আর 'বামপন্থী' পূর্বতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক কোটিই হোক, প্রতিদিন সীমান্তে বি এস এফের সহায়তায় কালোবাজারি, চোরা-কারবারিদের যে অবাধ যাতায়াত চলছে — সে ব্যাপারে তাঁরা কোন উচ্চবাচ্য করেননি কেন? এগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে কখনো কখনো কিছু হুমকি শোনা গেলেও দৃঢ় কোন উদ্যোগ কেন্দ্র রাজ্য কোন সরকারই নেয়নি। তাছাড়া দারিদ্র্যের কারণে জীবিকার সন্ধানে অনুপ্রবেশ, আর কালো-বাজারী-চোরাকারবারী-সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ এক জিনিস নয়, ফলে এই দুই ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও এক হতে পারে না। অথচ অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের নামে বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে পুরো অত্যাচার ও হয়রানি নেমে আসে অসহায় দরিদ্র মানুষের ওপর, চোরাকারবারী ও অপরাধ জগতের লোকেরা অর্থ ও ওপরতলার খুঁটির জোরে পার পেয়ে যায়।

জীবন জীবিকার অপেক্ষাকৃত উন্নত সুযোগের আশায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসা-যাওয়া একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং গোটা বিশ্বজুড়ে এটি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। একদিন যখন পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার এই আধিক্য ছিল না, সেদিনও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ জীবিকার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ভেসে বেড়াত। আর্যদের ভারতে আগমন এভাবেই ঘটেছে। আধুনিক সভ্য জগতেও এর বিরাম নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির জনসমষ্টির প্রায় পুরোটাই বাইরে থেকে আসা। আবার এশিয়ার অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকার টানে ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করছে। ভারত থেকেও কয়েক লক্ষ মানুষ জীবিকার সন্ধানে গিয়ে ঐ দেশগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এইভাবে দেশান্তরে যাওয়ার জন্য যেখানে আইনগত সুবিধা আছে সেখানে আইন মেনে সকলে যাচ্ছে, যেক্ষেত্রে তা নেই সেখানে বেআইনীভাবেই মানুষ যায়। তাই প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। সমস্যাটির গুরুত্ব বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে এর সঠিক সমাধানে আমরা পৌঁছতে পারব না শুধু নয়, উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো এর দ্বারা লাভবান হবে।

একথা আজ সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন যে, স্বাধীনতার পর পঞ্চান্ন বছর অতিক্রান্ত হলেও আমাদের দেশের মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পর্যন্ত মেটাতে কোন সরকারই পারেনি। উপরন্তু, সরকারের পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জনগণের সর্বনাশ ঘটেছে। এই মালিকশ্রেণীর স্বার্থেই সরকারের অনুসৃত সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন তথা উদারীকরণ নীতির ফলে মানুষের দুর্ভোগ চরম সীমায় পৌঁছেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, কাজের সুযোগ সবকিছুই সাধারণ মানুষের হাতছাড়া হতে বসেছে। একদিকে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী মানুষকে শোষণ করে পুঁজির পাহাড় জমাচ্ছে, অপরদিকে মালিক শ্রেণীর শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ নিরুপায় হয়ে কখনো আত্মহত্যা করছে, কখনো কাজের আশায় পাগলের মতো ছুটছে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, কখনো এক দেশ থেকে অন্য দেশে। শোষিত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বাড়ছে ক্রমাগত। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আকারে বিক্ষোভে ফেটেও পড়ছে কোথাও কোথাও। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে গড়ে উঠছে আন্দোলন। এই বিক্ষুব্ধ মানুষ যাতে সংগঠিত আন্দোলনে সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে না পড়ে সেজন্য শাসকশ্রেণী সব দেশেই সবসময় চেষ্টা করে সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদ থেকে শোষিত মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের সমস্যাগুলি নানান ভাবে প্রচার করে তারা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তারা দেখাতে চায় জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির জন্য পুঁজিবাদ দায়ী নয়, দায়ী অন্য কিছু। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক উস্কানির পাশাপাশি অনুপ্রবেশ সমস্যাটিকে বর্তমানে বড় করে সামনে নিয়ে আসছে। বেকারির জন্য, অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বহিরাগত মানুষদেরই দায়ী করে প্রচার করছে। সাথে সাথে শাসক বিজেপি আজ এই আগত মানুষগুলিকে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করে হিন্দুদের উদ্বাস্তু বা শরণার্থী এবং মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী বলে প্রচার করছে।

তাদের মতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে আসছে সীমান্ত জেলাগুলির তথা পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যায় হিন্দু মুসলমান বিন্যাসটিকে বদলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এইভাবে অনুপ্রবেশ সমস্যাটিকে নিয়ে তারা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করছে এবং মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে তাদের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতের তুলনায় বহুগুণ খারাপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সেই দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভও কম নয়। এই ক্ষোভকে চাপা দিতে, দিগ্‌ভ্রান্ত করতে সে দেশের পরস্পরবিরোধী প্রধান দুই শাসক দলের একদল ভারত ঘেঁষা নীতি নিয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখায়, অন্যদল অন্যান্য কিছুর সাথে মাঝে মাঝেই ভারত বিরোধী জিগির তোলে। দেশের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করে দেশবিভাগ এবং ভারতের আধিপত্যবাদী নীতিকেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভারতের শাসকদের নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সে দেশের সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে উস্কে দিয়ে এই ভারত বিরোধী জিগির তোলে সে দেশের শাসকশ্রেণী। এই জিগিরকে কখনো ভারত বনাম বাংলাদেশ হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে আবার কখনো একে হিন্দু-মুসলমান লড়াই হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে। বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি এন পি-জামাত জোট ভারত বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক প্রচারকেই মূল হাতিয়ার করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উভয় দেশের শাসকশ্রেণীই মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকে চাপা দিতে এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই অনুপ্রবেশ ইস্যুটিকে কাজে লাগাচ্ছে। এছাড়াও আমাদের দেশে যেমন হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সক্রিয়, বর্তমানে বাংলাদেশেও মুসলমান মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সক্রিয়। যত বেশি উগ্র হিন্দুত্বের জিগির উঠছে মুসলিম মৌলবাদীদের তত সুবিধা হচ্ছে। তারা শাসকশ্রেণীর মদতে শ্রমজীবী মানুষকে বিভাজিত করে রাখার জন্য সব সময়েই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতে অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে নোংরা রাজনীতির খেলা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক পূর্ববঙ্গের মানুষ এদেশে এসেছিল নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি অনুসারে তাদের শরণার্থী হিসাবেই এদেশের মানুষ এবং সরকারও স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যারা এসেছে, '৭২ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী তারা অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই গণ্য হয়। একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির কোন জনগোষ্ঠীকে সীমান্ত লাইন দিয়ে বিভক্ত করলে বহু ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সর্বত্র তাই হয়েছে। এই সমস্যার অন্যান্য দিকগুলির সাথে একটি মানবিক দিকও আছে— যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পুরুষানুক্রমে বসবাসের ঐতিহ্য, জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু পরিত্যাগ করে কেউ আর এক দেশে চলে যেতে বাধ্য হলেও পরিত্যক্ত দেশটিকে সে বিদেশ বলে ভাবতে পারে না। এছাড়াও আত্মীয়তা-পরিচিতিকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মানুষের মধ্যে যাতায়াত চলতেই থাকে। এবং এই যাতায়াতের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম সহজ না হলে দরিদ্র সাধারণ মানুষ চিরকালই নিজেদের মতো করে যাতায়াতের উপায় বের করে। একে সব সময় আইন দিয়ে আটকানো যায় না। সীমান্তরক্ষীদের চূড়ান্ত দুর্নীতি কাজটা আরও সহজ করে দেয়। পশ্চিমবাংলাতেও ঠিক এই জিনিষই চলছে।

কিছুদিন আগে ২১৩ জন বাংলাদেশি বেদেদের অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তারাও ভারতে স্থায়ী বসবাসের জন্য আসেনি। তারা জীবিকার জন্য সাপের খেলা দেখিয়ে, ওষুধ বিক্রি করে সব সময়েই এদেশে ওদেশে ঘুরে বেড়ায়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাও এই অনুপ্রবেশ সম্পর্কে স্বীকার করেছেন যে, 'বাংলাদেশের অর্থনীতির খারাপ অবস্থার কারণেই জীবিকার সন্ধানে মানুষ দেশ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার দেশে আশ্রয় নিচ্ছে।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৬.২.০৩)। অথচ, যশবন্ত সিন্‌হার দল বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি একেই মুসলিম অনুপ্রবেশ বলে হৈ চৈ তুলছে এবং এর পেছনে আই এস আই-এর চক্রান্ত দেখছে। তারা এতদূর পর্যন্ত বলছে যে, বাংলাদেশী মুসলিম মৌলবাদীরা এইভাবে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতাকেই বিনষ্ট করবে। এই প্রচারে অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি সহ বিজেপি নেতাদের মদতও স্পষ্ট। এ যুক্তি যে কতখানি হাস্যকর তা তাঁরাও জানেন। প্রথমত কোন একটি দেশে এক সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যার কম-বেশির ওপর সেই দেশের নিরাপত্তা বা অখণ্ডতা নির্ভর করে না। নির্ভর করে সেই দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারি দলগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসৃত নীতির উপর। না হলে সংখ্যায় বহুলাংশে কম, মাত্র কয়েক হাজার ব্রিটিশ ৫০ কোটি ভারতবাসীকে দুশো বছর ধরে শাসন করতে পারত না। মার্কিন নাগরিকদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভাড়াবৃদ্ধি অন্যায়, আন্দোলন তো হবেই

সি পি আই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার আবার বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিল। প্রতিবারের মতো এবারও কারণ হিসাবে তেলের দামবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে যদিও সেজন্য ট্রামের ভাড়া কেন বাড়ানো হল তার কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই। যাত্রী সাধারণকে বাড়তি ভাড়া বয়কট করার আহ্বান জানানো হয়েছে, পাশপাশি ২৫ মার্চ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিন বিধানসভার সামনে এস ইউ সি আই কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ৩১ মার্চ, ১ ও ২ এপ্রিলও রাজপথে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে এস ইউ সি আই। এইসব বিক্ষোভে পুলিশ যেভাবে লাঠি চালিয়েছে, মহিলা কর্মীদের বুক, পেট ও পায়ে বুটের লাথি মেরেছে, টিভি'র পর্দায় তার ছবি দেখে গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ ঘৃণায় সোচ্চার হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর 'সংবেদনশীল প্রশাসন' নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের প্রতি, এমনকি সংগ্রামী মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি কী বর্বর আচরণ করে, এই ঘটনা তা আবার দেখিয়ে দিল। সাথে সাথে এই ঘটনা একথাও স্পষ্ট করে দিল যে, পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে এস ইউ সি আই কর্মীদের গণআন্দোলনের পথ থেকে সরানো যাবে না।

এবারও বাসমালিকরা ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানানোর আগেই পরিবহনমন্ত্রী বাসমালিকদের অসুবিধার কথা 'বুঝে নিয়ে' ভাড়া বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন। অথচ, এই পরিবহনমন্ত্রী গত আগস্ট '০২ মাসে ভাড়া বাড়ানোর সময় বলেছিলেন, বেশি করে ভাড়া বাড়ান হল যাতে ভবিষ্যতে তেলের দাম বাড়লে ভাড়া বাড়াতে না হয়। তিনি আরও বলেছিলেন, ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির (যদিও বাস্তবে বাড়ানো হয়েছিল অনেক বেশি হারে) মধ্যে ৬ শতাংশ তেলের দামবৃদ্ধির জন্য, আর ৯ শতাংশ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য দেখার জন্য মালিকরা পাবেন। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য এক কণাও বাড়েনি, ফলে ঐ ৯ শতাংশ বাড়তি মুনাফা মালিকরা করছেই। এবিষয়ে মন্ত্রী একটি কথাও বললেন না। সংকেত বুঝে নিয়ে মালিকরাও যথারীতি বাস ধর্মঘটের হুমকি দিল ও নাটক করল, সরকারও বর্ধিত ভাড়া ঘোষণা করে দিয়ে বলল ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় নেই। বাসমালিকদের কল্পিত উপায়হীনতার কথা ভেবে মন্ত্রীদের হৃদয় বিগলিত হল, তাঁরা কিন্তু ভেবে দেখলেন না, রাজ্যের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারি, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি ও নিত্যনতুন করবৃদ্ধির চাপে যারা নুয়ে পড়েছে, তারা এই বাড়তি ভাড়ার বোঝা বইবে কী উপায়ে?

পুলিশি বর্বরতা ঃ ২৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সামনে প্রতিবাদকারী এস ইউ সি আই মহিলাকর্মীর শরীরে পুলিশের বুট

জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলে দফায় দফায় ভাড়াবৃদ্ধির আগে অন্য উপায় তাঁরা ভাবতেন, পেট্রল-ডিজেলের উপর রাজ্য সরকারের চাপানো ট্যাক্স ও সেস প্রত্যাহার করতে পারতেন এবং সেটাকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিয়ে কেন্দ্র সরকারকেও কেন্দ্রীয় ট্যাক্স তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে পারতেন, এই দাবিতে জনগণকে নিয়ে আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারতেন। এরকম কিছুই তাঁরা করলেন না। উল্টে পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধির মতো অতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় মন্ত্রী, "কল্‌মি শাকের মূল্যবৃদ্ধি হলে আন্দোলন হয়না, ভাড়া বাড়ালেই কেবল আন্দোলন হয়' এই মন্তব্য করে বর্ধিত ভাড়ার চাপে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করলেন। মালিকশ্রেণীর চিন্তা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সি পি আই (এম) নেতা-মন্ত্রীরা কী অদ্ভুতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন, সেটা বোঝা যায় মন্ত্রীর অপর একটি মন্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, 'ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাভ হবে না, তাতে ভাড়া কমবে না।' কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীরাও এই রাজ্যে একদা এমন বলতেন, তবুও তখন আন্দোলন হয়েছে, কিছু কিছু দাবিও আদায় করেছে জনগণ। বামফ্রন্ট শাসনেও জনগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে একমাত্র আন্দোলন করেই দাবি আদায় করা যায়। প্রাথমিকে ইংরাজি, বিদ্যুৎ মাশুল, হাসপাতালের চার্জ, শিক্ষার ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই মানুষ কিছু দাবি আদায় করতে পেরেছে। তাছাড়া এই ইতিহাসও বর্তমান শাসকদলের ভোলা উচিত নয় যে, গণআন্দোলনের জোয়ারেই শেষপর্যন্ত কংগ্রেসকে এই রাজ্যে সরকারি ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়েছিল।

আর একটা ভিয়েতনামের ভয় করছে আমেরিকা

কেউ প্রকাশ্যে ভিয়েতনাম শব্দটি উচ্চারণ না করলেও আমেরিকান যুদ্ধপরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ক্রমেই এই আতঙ্ক দানা বাঁধছে যে, ইরাকে মার্কিন অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আমেরিকার প্রশাসনিক কর্তারা এখন মার্কিন প্রচারমাধ্যমে স্বীকার করছেন যে, অপ্রত্যাশিত ইরাকি প্রতিরোধ, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ভুল পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎবাণী আমেরিকাকে দীর্ঘতর ও আরও বেশি ব্যয়বহুল যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে পারে, যেটা আগে আদৌ ভাবা যায় নি।

কিন্তু ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা পেন্টাগনের বৈঠকগুলোতে সামরিক কর্তারা নাকি দীর্ঘ ও কঠিন যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা কয়েক সপ্তাহ ধরেই বলেছিলেন। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা লিখেছে — এক ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসার ঐ পত্রিকাকেই নাকি প্রশ্ন করেন — "আমায় বলতে পারেন, এ যুদ্ধের শেষ হবে কী উপায়ে?' ফলে, ইরাক যুদ্ধের চিত্রনাট্য আমেরিকাকে নতুন করে লিখতে হচ্ছে।

সাংবাদিক ও বিভিন্ন নাগরিকরা এখন অতীতের নজির ও বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ দুটোই দেখিয়ে বলেছেন, বুশ সরকার ইরাক সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ভুল করেছে। এক সাংবাদিক লিখেছেন, "এই পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র আমাদের সরকারই, মানুষের জীবন নিয়ে তাদের কত উদ্বেগ, তা দেখাতে নিখুঁত দক্ষতায় বোমা ফেলে মানুষ মারে। নিখুঁত লক্ষ্যে বোমাবর্ষণ আমাদের প্রযুক্তিগত শক্তির বিরাট পরিচয় দেয়, একই সাথে তা আমাদের রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় সংবেদনশীলতার অভাবেরও সাক্ষ্য দেয়।

(ওয়াশিংটন থেকে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সাংবাদিকের প্রতিবেদন ২৮-৩-০৩)

২৭ মার্চ ঃ নিউইয়র্কের ফিফথ্ এ্যাভেনিউয়ে রাস্তায় শুয়ে অবরোধে সামিল মানুষ। তাদের দাবি, যুদ্ধক্ষেত্রের সত্য সংবাদ জানাতে হবে।

প্রতিবাদে লণ্ডনের রাস্তায় স্কুল ছাত্ররা

কী করতে হবে — কেউ তাদের বলে দেয়নি। সুইজারল্যাণ্ড, গ্রীস, ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্মানি, ইটালি স্পেন অস্ট্রেলিয়ার শিশুদের মতই ইংল্যাণ্ডের স্কুল ছাত্ররা যুদ্ধের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। মাসের পর মাস টানা যুদ্ধ-উত্তেজনা, ধ্বংসের আতঙ্ক এবং শিশুমনের স্বাভাবিক কোমলতা স্কুলের শিশুদেরও পথে টেনে এনেছে। গ্লস্টনবেরির সেণ্ট ডানস্টন স্কুলের প্রায় ১ হাজার শিশু স্কুলের মাঠেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যারা একটু বড় — ১২ থেকে ১৫ বছরের, তারা এডিনবরা দুর্গ দখলের মহড়া দিয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে স্কুলের সিলেবাস রচয়িতা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের 'সক্রিয় নাগরিক' হওয়ার পাঠ নিতে বলেছিলেন। তারা নিশ্চয় ভাবেন নি সক্রিয় হতে গিয়ে পাঠ্যক্রমের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছাত্ররা পার্লামেণ্ট স্কোয়ারে সমবেত হবে, ম্যাঞ্চেস্টারের রাজপথে জড়ো হয়ে বলবে — 'এ যুদ্ধ আমাদের নয়' বলবে 'বোমা নয় বই চাই'।

বাংলার এক কবি পৃথিবীকে শিশুদের বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলেন, আজ শিশুরাই নেমেছে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করতে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপি ও সি পি এম-এর ধুরন্ধর রাজনীতি

চারের পাতার পর

কোনরকম অনুপ্রবেশ না ঘটিয়েই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের নীতি নির্ধারণে এতখানি প্রভাব ফেলতে পারত না। দ্বিতীয়ত, সেদিনও ভারত বিভাগ জনতার ইচ্ছায় হয়নি — সে হিন্দুই হোক, কি মুসলমানই হোক এবং তা তাদের সংখ্যার উপরও নির্ভর করেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ধরেই 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি নিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর চেষ্টা করছিল। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সাভারকরের নেতৃত্বে প্রথম ধর্মভিত্তিক জাতি পরিচয় এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি তোলা হয়। কংগ্রেসও ছিল হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। এই অবস্থায় মুসলিম লিগও দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-এর অপব্যাখ্যা করে কার্যত পাকিস্তানের দাবিকেই জোরদার করে। হিন্দু মহাসভার তোলা দ্বিজাতিতত্ত্ব মুসলিম লিগ আঁকড়ে ধরায় ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে তা আশীর্বাদ হয়ে আসে। তারা ভারত ভাগের পদক্ষেপ নেয়।

এখন দেখা যাক, বিজেপি এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলি, অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে অভিযোগ তুলছে তা কতখানি সত্য। ১৯৯৭ সালের ৬ই মে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ভারতে এক কোটি বাংলাদেশি আছে। ঐ তথ্য তিনি কোথা থেকে কীভাবে পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করেননি। আদবানি সংসদে এই সংখ্যাকে বলেছেন দেড় কোটি, সংসদের বাইরে কখনো বলেছেন দু কোটি। অর্থাৎ ৪-৫ বছরের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের ১ কোটি বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। উপপ্রধানমন্ত্রীও এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন তা বলেননি। এই তথ্য মেনে নিলে যে ভয়াবহ বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা হল প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার বাংলাদেশি স্রোতের মতো ভারতে ঢুকছে। বাস্তব ঘটনা কি আদৌ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১১ কোটি। উপপ্রধানমন্ত্রীর ২ কোটি সংখ্যাটি সত্য হলে বলতে হয় গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ লোকই ভারতে এসে গিয়েছে এবং এসেছে দিনে রাতে প্রতি ঘণ্টায় ৭৬ জন করে। এমন অসম্ভব যদি সম্ভব হয় তা হলে শত শত কোটি টাকা খরচ করে যে বি এস এফ বাহিনীকে সীমান্তে প্রহরার জন্য রাখা হয়েছে তারা কী দায়িত্ব পালন করছে? দায়িত্বে অবহেলার জন্য কতজন বি এস এফ অফিসারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? না হলে, কেন হয়নি? এর উত্তর তো কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকেই দিতে হবে। বাস্তবে অনুপ্রবেশ এবং সংখ্যা বৃদ্ধির এই চিত্র ভিন্ন রকমের।

ভারত সরকারের জনগণনা রিপোর্ট দেখিয়েছে ১৯৯১-২০০১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় হার যেখানে ২১.৩ শতাংশ, সেখানে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি, যথা আসামে ১৮.৮৫ শতাংশ, ত্রিপুরায় ১৫.৭৪ শতাংশ এবং পশ্চিমবাংলায় ১৭.৮৪ শতাংশ। পশ্চিমবাংলার মধ্যেও এই হার সীমান্তবর্তী জেলাগুলির থেকে মেদিনীপুর জেলায় বেশি। তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কথা বলা হচ্ছে কীসের ভিত্তিতে? অথচ এই পরিসংখ্যানের নানান কারসাজিকে তাঁরা সাম্প্রদায়িক উস্কানির কাজে লাগাচ্ছে। সিকিমে ১৯৮১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩৪২ জন এবং চণ্ডীগড়ে ছিল ৩৪০০ জন। ১৯৯১ সালে ঐ দুই জায়গায় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২০১০ ও ১৫০০০-এর মতো। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৫৭০ শতাংশ ও ৪৪০ শতাংশ। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার দেখলে চমকে উঠতেই হয়। এই শতকরা হারই হল হিন্দুত্ববাদীদের হাতিয়ার। কেন সিকিম ও চণ্ডীগড়ে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তার উত্তর ঐ হিন্দুত্ববাদীরা জানলেও দেবেনা। ১৯৭৪ সালে সিকিমের ভারতভুক্তির পর প্রথম ১০-১৫ বছর ভারত সরকার বেশ কিছু নির্মাণমূলক কাজ করেছিল। এই কাজের জন্য কন্ট্রাকটররা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে হিন্দু-মুসলমান কর্মীদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ জীবিকার টানেই ওখানে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। চণ্ডীগড়েও একই কারণ। বিজেপি নেতারা প্রচার করছেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। আবার তাঁরাই বলছেন, বাংলাদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুসলমানদের অত্যাচারে ভারতে চলে আসার ফলে বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশে।

বিজেপি-সি পি এম সহ শাসকদলগুলি এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই ভাবছেন, আমাদের দুরবস্থার জন্য, বেকারি-মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষগুলিই দায়ী। এঁদের সংখ্যাটা শাসকদলগুলি সবসময়েই বাস্তবের থেকে বহুগুণ বাড়িয়েই বলে যার থেকে মানুষের আতঙ্কও বাড়ে। বাস্তবে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণেই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মানুষ শোষিত হতে হতে আজ ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বাজারের অভাবে হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, নতুন নতুন কল-কারখানা খুলছে না। সরকারের প্রতিটি স্তরে চুরি-দুর্নীতি সীমাহীন। যতটুকুও বাজার রয়েছে, বিশ্বায়নের নামে তাকে অবাধ লুঠের জন্য দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। চাষের খরচ বিপুল পরিমাণে বাড়লেও ফসলের দাম নেই। চাষির খরচ পোষায় না— দালালেই সব আত্মসাৎ করে। ফলে যাঁরা মনে করছেন অনুপ্রবেশকারী কিছু মানুষ চলে গেলেই আমরা কাজ পাব, সেটা ঠিক নয়। দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই তো এ সমস্যা নেই— তাহলে সেখানেও জনজীবন একই সমস্যায় জর্জরিত কেন?

অনুপ্রবেশ প্রশ্নে রাজ্যবাসীকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে সরকারি বামপন্থীদের আচরণ। এই প্রশ্নে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাদের সুরের মিল বিস্ময়কে সন্দেহে পরিণত করছে। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষ এরাজ্যে শরণার্থী হিসাবেই গণ্য হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য বামপন্থীরাই উদ্যোগী হয়েছে, আন্দোলন করেছে। কিন্তু আজ গোটা দেশের মতোই পশ্চিমবাংলায়ও মানুষ সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের অপশাসনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সেই ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রতিবাদ প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের বামপন্থী মুখোশটা ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। সরকার যতই সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততই মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে শাসক শ্রেণী চিরকাল যা করে— সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তুলছে, অনুপ্রবেশকে দায়ী করছে, সুকৌশলে সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিচ্ছে। এ প্রশ্নে বিজেপির সাথে তারা এতখানি সহমত যে, তাদের 'চিরবৈরী' বলে ঘোষিত, বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি দুবেলা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশংসা করছেন। ফলস্বরূপ নিরীহ সংখ্যালঘু মানুষ সর্বত্র পুলিশী হয়রানির শিকার হচ্ছে। তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা। এমন কি, অন্যান্য রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষ মাত্রই পুলিশী হয়রানির শিকার হচ্ছে। এরাজ্যে সিপিএম ভোটের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের আই এস আই-এর চর, অনুপ্রবেশকারী প্রভৃতি বলে প্রথমে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে পরে আবার নিজেরাই ত্রাতা সাজছে।

এমতাবস্থায়, অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপি এবং সিপিএমের ধুরন্ধর রাজনীতিটি আজ সকলকেই বুঝতে হবে। কারণ এটি এমন একটি ইস্যু যা দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দুই দেশের জনসাধারণের শোষণমুক্তির আন্দোলনে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি করবে এবং শাসকশ্রেণীর হাতকেই শক্তিশালী করবে। ফলে এই ইস্যুটিকে সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত মন নিয়ে বিচার করতে হবে। সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত অর্থে উদ্যোগী হওয়ার জন্য উভয় সরকারের কাছে দাবি তুলতে হবে। দাবি তুলতে হবে ঃ

১) সীমান্ত এলাকায় চুরি, দুর্নীতি, চোরাচালান, কালোবাজারী এবং সমস্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,

২) যে সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার ও ব্যক্তি চোরাচালান, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও নানা অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত তাদের দৃষ্টান্ত-মূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে.

৩) সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরোপুরি মুক্ত সংবেদনশীল দরদী মন নিয়ে অনুপ্রবেশকারী দরিদ্র অসহায় মানুষদের বিষয়টি সমাধান করতে হবে,

৪) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার ছিটমহল সমস্যার সমাধান করতে হবে,

৫) দেশভাগের ফলে সীমান্ত এলাকায় যাদের বাস্তুভিটা এপারে এবং সম্পত্তি ও জমিজমা ওপারে পড়েছে তার সুষ্ঠু বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

সিডনি, মেলবোর্ণ, ব্রিসবেন, সিওল

যুদ্ধবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

২৬ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইরাকে আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার সামরিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল বার করে। মিছিলে প্রাথমিক স্কুলের ১০ বছর বয়সী ছাত্ররাও ছিল। মিছিলকারীরা মার্কিন দূতাবাস ও ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির রেস্টুরেন্টে ভাঙচুর চালালে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে।

মেলবোর্ণ শহরেও স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিল হয়। মিছিলকারীরা সংখ্যায় ছিল ১৫০০। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্ররাও এই মিছিলে অংশ নিয়েছে। এখানেও পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে।

ব্রিসবেন শহরে স্কুল-কলেজের ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী যুদ্ধবিরোধী মিছিল বার করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে মার্কিন দূতাবাস ও ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির রেস্টুরেন্টে ভাঙচুর চালা-বার সময় পুলিশ ৩০ জনের ওপর বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা শহরেও যুদ্ধবিরোধীরা সে দেশে আমেরিকান ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ২৭ মার্চ, ২০০৩)

ইরাক আক্রমণের প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ছাত্র ধর্মঘটে (বাঁয়ে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ডাইনে) যোগমায়া দেবী কলেজ

বিপ্লব শব্দটির তাৎপর্য আমাদের কাছে সুমহান

— ভগৎ সিং

২৩ মার্চ দিনটি শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবস। ভগৎ সিং-দের কথা আজ আর জানানো হয় না নতুন প্রজন্মকে। এঁদের জীবন, আত্মদান, চিন্তাধারার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার কোন উদ্যোগ নেই সরকারি তরফে। দেশের তরুণশক্তিকে জানানো হয় না শহীদ ভগৎ সিং কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফাঁসি দেওয়ার জন্য যখন জেলের সেপাই সেল থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে আসে, তখন তিনি নিবিষ্টচিত্তে লেনিনের "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" বইটি পড়ছিলেন। তিনি সেপাইটিকে বলেছিলেন — "দাঁড়ান, একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।"

নিপীড়িত মানুষের পরাধীনতা, দুঃখযন্ত্রণা ভগৎ সিংকে অল্পবয়সেই ঘরছাড়া করেছিল। ডিগ্রি, চাকরির মোহ, সুখী গৃহীজীবন কোনকিছুই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ সিং গভীর অধ্যয়ন করেছেন। যুগ যুগ ধরে একশ্রেণীর লোক তাদের শাসনশোষণের স্বার্থে বেশীরভাগ মানুষের উপর যে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে — তার হাত থেকে অত্যাচারিত শোষিত মানুষের মুক্তির সঠিক রাস্তা কোনটি, কীভাবে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে — স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি নিরন্তর এই চিন্তাই ভগৎ সিংকে সত্যানুসন্ধানী করে তুলেছিল। তাঁকে পড়তে হয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন। পড়তে হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। তদানীন্তন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের মধ্যে এতখানি অগ্রসর চিন্তা নিয়ে আমরা আর কোন বিপ্লবীকে পাইনা। রাজনীতিতে উন্নত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও উচ্চ হৃদয়বৃত্তির দৃষ্টান্ত আমরা পাই ভগৎ সিং-এর জীবনের নানা ঘটনায়। নিজের ফাঁসির আদেশ শোনার পর ভগৎ সিং বটুকেশ্বর দত্তকে একটি চিঠিতে লেখেন, "আমার দণ্ড হয়েছে ফাঁসি, কিন্তু তোমার জন্য আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তুমি বেঁচে থাকবে, বেঁচে থেকে দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবে আদর্শের জন্য বিপ্লবীরা শুধু মরতেই পারে তা নয়, বেঁচে থেকে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মোকাবিলাও করতে জানে। মরণ, পার্থিব যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবার উপায় না হওয়াই উচিত। কিন্তু যে বিপ্লবী ঘটনাচক্রে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা পেল, দুনিয়াকে তার দেখিয়ে দেওয়া উচিত, সে কেবল ফাঁসিকাঠে চড়তেই জানে না, কারাগারের ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে দিনের পর দিন চরম অত্যাচারকেও সহ্য করতে সে জানে।" ভগৎ সিং-এর এই চিঠির মধ্যে আদর্শের প্রতি গভীর উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়।

তরুণদের উদ্দেশে একটি ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এরই অবিচ্ছেদ্য প্রাথমিক কাজ হলো রাজনৈতিক বিপ্লব সফল করা। তাই-ই আমরা করতে চাই। রাজনৈতিক বিপ্লব মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্র হস্তান্তর করা বোঝায় না। আমাদের সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী লক্ষ্য আছে, জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আমরা চাই। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে — গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করার পথে সংগঠিতভাবে আমাদের এগোতে হবে। বিপ্লবের এই সঠিক ধারণা যদি আপনার না থাকে তবে দয়া করে থামুন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান তুলবেন না। বিপ্লব শব্দটির তাৎপর্য অন্তত আমাদের কাছে সুমহান। এ শব্দটিকে যেমন তেমন করে ব্যবহার করতে বা অপব্যবহার করতে আমরা দিতে পারি না।" এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্র এবং সরকারি প্রশাসন শাসকশ্রেণীর একটা হাতিয়ার — যা দিয়ে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, নিজের স্বার্থকে রক্ষা করে। আমরা এই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মার্কসবাদের চিন্তা অনুযায়ী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাই। এ কারণেই সরকারি ক্ষমতা হাতে পাবার জন্য আমরা লড়ছি। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে গড়ে তোলা যায়। বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য বিপ্লবী কর্মীদের অপরিসীম আত্মত্যাগ প্রয়োজন। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনি যদি ব্যবসায়ী হন কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং পারিবারিক পিছুটান যদি আপনার থাকে তবে এ পথ আপনার জন্য নয়। বিপ্লবী দলের নেতা হবার যোগ্যতা আপনার নেই। সান্ধ্য অবকাশে কিছু ভাষণ দেবার মত নেতা আমাদের অনেক আছে, এসব নেতাদের কোন মূল্যই নেই। লেনিন যাকে বলছেন জাতবিপ্লবী, তেমন ধরনের নেতা আমাদের চাই। আমাদের চাই এমনসব সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী, বিপ্লব ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবের জন্য কাজ ছাড়া আর কোন কাজ যাদের নেই। সুপরিকল্পিত অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো জাত বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত একটি দল — আদর্শ সম্পর্কে যাদের ধারণা সুস্পষ্ট, যাদের পর্যবেক্ষণ নিখুঁত, উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যাদের আছে।"

বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে ভগৎ সিং বলছেন, "শুধু আবেগ কিংবা আত্মদান নয়, এর জন্য প্রয়োজন সহিষ্ণুতা এবং আত্মত্যাগে উজ্জ্বল দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন। নিজের ব্যক্তিগত আরাম আয়াসের জীবনকে ঝেড়ে ফেলুন। তারপর বিপ্লবী কাজ করুন। তিলে তিলে আপনাকে এগুতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অদম্য সাহস, অধ্যবসায় এবং কঠোর সঙ্কল্প। কোন বাধা, কোন প্রতিবন্ধকতা যেন আপনাদের নিরুৎসাহিত করতে না পারে, কোন ব্যর্থতা, কোন বিশ্বাস-ঘাতকতা যেন আপনাদের হতোদ্যম করতে না পারে। অসীম সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার পর আসবে অনিবার্য বিজয়।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে দেশাত্মবোধ ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবাহ বইছিল ভগৎ সিং সেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার মধ্যে থেকেও একটা ছেদ রচনা করেন। ধর্ম সম্পর্কিত ভগৎ সিং-এর বক্তব্য আজকের দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন, "ধর্ম আমাদের অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যেমন ধরুন আমরা চাই সমস্ত মানুষ সমান হোক, মানুষে মানুষে উঁচুনীচু বা অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ যেন না থাকে। কিন্তু সনাতন ধর্ম তো এই ভেদাভেদের পক্ষে। এই বিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মৌলবীরা আজও মেথরের ছেলের কাছ থেকে গলায় মালা নেন তারপর কাপড় চোপড় সহ স্নান করে শুদ্ধ হন। অচ্ছুৎদের তারা পৈতা পরার অধিকার দেন না। এমন যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে কিছু না বলে নীরবতাই যদি শ্রেয় মনে করি তবে তো সবকিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে মরে বসে থাকতে হয়। আর তা না হলে ধর্মের বিরোধিতা করতে হয়। ধর্মে বলা হয়েছে ইস্‌লামের উপর যাদের বিশ্বাস নেই তলোয়ারের ঘায়ে সেই কাফেরদের শিরশ্ছেদ করতে হবে। কাজেই এখন যে ঐক্যের দোহাই দেওয়া হচ্ছে তার পরিণাম আর কীই বা হতে পারে। আমরা জানি হয়ত আবার নতুন মন্ত্রে ঐক্যের ধূয়া তোলা হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সমস্যার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবার চেষ্টা আমরা করব না কেন? চোখের উপর আমরা দেখছি ধর্ম আমাদের সামনে পর্বত প্রমাণ বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একের ধর্ম বলছে গরু কাটা চলবে, অন্যের ধর্মে লেখা আছে গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে হবে। তাহলে এখন কী হবে? যদি অশ্বত্থ গাছের ডাল ভাঙলেই ধর্ম ভেঙে পড়ে তাহলে কীই বা করা যায়। এইসব ধর্মীয় দর্শন, সংস্কার ও ধর্মীয় আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভেদ শেষপর্যন্ত জাতীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ভিত্তি করে পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর অশুভ পরিণাম যে কী তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যতদিন পারস্পরিক বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে আমরা এক না হব, ততদিন বাস্তবে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। কেবলমাত্র বৃটিশ সিংহের থাবা থেকে মুক্তি পাওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হলো সমস্ত মানুষের মিলেমিশে থাকবার ক্ষমতা অর্জন এবং সর্বপ্রকার মানসিক দাসত্ব ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি।"

ভগৎ সিং যুক্তিকেই বলেছেন জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি বলেছেন, "কেবল বিশ্বাস বিশেষ করে অন্ধ বিশ্বাস খুবই বিপজ্জনক। ঐ প্রবণতা মানুষের চিন্তাশক্তিকেই নষ্ট করে দেয়। মগজকে ভোঁতা করে দেয়। মানুষ এরই ফলে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।"

আজ সরকারি রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের নোংরামি, নীতিহীন জীবনযাপন দেখে বিবেকবান মানুষেরা আঁতকে উঠছেন। অনেকে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার ভগৎ সিংয়ের মতো উন্নত চরিত্রের সৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকেই হয়েছিল, যে রাজনীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসাই এই রাজনীতির মূল মন্ত্র। তাই, ভগৎ সিং-এর মতো যুবক আজ সমাজে সৃষ্টি করতে চাইলে ভোটসর্বস্ব নোংরা রাজনীতিকে পরাস্ত করে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিশারী উন্নত রাজনীতির চর্চা করতে হবে। রাজনীতি থেকে মুখ ফেরালে প্রতিক্রিয়াশীল নোংরা রাজনীতির হাতই শক্তিশালী হবে।

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

একের পাতার পর

সকল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে দেশব্যাপী যুক্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি প্রয়োজন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার

১) ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে মার্কিন-ব্রিটিশ জোটকে তোষণ করে চলার বর্তমান নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করে এবং স্পষ্ট ভাষায় ইরাকে নগ্ন আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে;

২) অবিলম্বে ইরাকের মাটি ছাড়তে বাধ্য করার জন্য আমেরিকা ব্রিটেনের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা সহ যাবতীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাথে সাথে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে —

মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যদি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও ইরাক ছাড়তে অস্বীকার করে তাহলে ভারতে সকল আমেরিকান ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাবগুলি আপনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। সত্বর ইতিবাচক সাড়া প্রত্যাশা করছি।

সংসদের সামনে জেপিএ-র বিক্ষোভ

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ অ্যাকশান'-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির প্রতিনিধি ও কর্মীরা সহ দিল্লির বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের কর্মীরা 'যন্তর মন্তর' থেকে এক প্রতিবাদী মিছিলে সামিল হয়ে সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা একদিকে পেনসন দেওয়ার দায়িত্ব থেকে সরকারের সরে আসা, কর্মী সংখ্যা কমানো, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার আবার কমানো এবং বাড়তি কর ও ঘাটতি বাজেটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; অন্যদিকে কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় ফর্মস্ স্টোর অফিস বন্ধ করা, কমিউনিটি হেলথ গাইড স্কীম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরে আসা এবং উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের অডিট কর্মচারী আন্দোলনের নেতা এন কে শর্মা সহ ৩ জনের ৩১ বছরের চাকরি বাজেয়াপ্ত করার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও কর্মচারী স্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে মুখর হয়েছিলেন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩৩ সংখ্যা ৮

পেপসি, কোকাকোলা সহ মার্কিন-ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করুন

জনগণের প্রতি এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

আমরা জানি, ইরাকের জনগণের উপর মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের ভয়ংকর হিংস্র আক্রমণ আপনাদের সকলকেই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে তুলেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারদের বিরুদ্ধে আপনাদের তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা ব্যক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে ইরাকের দেশপ্রেমিক জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করছে। আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছেন, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন তোষণ নীতি নিয়ে চলছে। আপনারা জানেন, এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দল লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা সি পি এম সহ আরও কিছু বাম ও গণতান্ত্রিক দলের সাথে যুক্ত প্রোগ্রামে সামিল হয়েছি। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হিসাবে আমরা অন্যান্য দলের কাছে এক প্রস্তাব রেখেছি। আপনাদের কাছে আবেদন, একদিকে ভারত সরকার যাতে আক্রমণকারী দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয় সেইভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন এবং নিজেরা উদ্যোগী হয়ে পেপসি, কোকাকোলা সহ অন্যান্য মার্কিন ও ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করুন।

৩০ মার্চ দুপুরে কলকাতায় সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের বিক্ষোভ

কুলতলিতে আবার সি পি এম-এর সন্ত্রাস

এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড দিলীপ সরদার নিহত

গত ১লা অক্টোবর ২০০২ কুলতলির নলগোড়া অঞ্চল পার্টি অফিস আক্রমণ করে সি পি এম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির আশ্রিত সমাজবিরোধীরা আমাদের দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অশোক হালদার এবং স্থানীয় কর্মী কমরেড মোসলেম মিস্ত্রীকে হত্যার পরে সারা রাজ্যের মানুষ সি পি এম তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধিক্কারে সোচ্চার হয়। জনরোষের সামনে কিছুদিনের জন্য উক্ত মন্ত্রী এবং তাঁর দোসররা শান্তির বাণী প্রচার করছিলেন। আমাদের কাছে খবর ছিল, কুলতলি-জয়নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কুখ্যাত সমাজবিরোধী, ডাকাত এবং ভাড়াটে খুনীদের নিয়ে বৈঠক করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও কর্মীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছেন।

আমাদের প্রাপ্ত সংবাদ যে সঠিক তা প্রমাণ হয়ে গেল গত ২৮ মার্চ। আমাদের দলের কর্মী কমরেড দিলীপ সরদার সেদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ জামতলা হাট থেকে তার বাড়ি মধুসূদনপুরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন খোলারঘেরীর মোড়ে সি পি এম সমর্থক শিব বণিকের বাড়ি থেকে কমরেড দিলীপের উপর বোমা ছুঁড়ে মারে দুষ্কৃতিরা। আচমকা এই আক্রমণে আহত কমরেড দিলীপ রাস্তার পাশে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিতে যান কিন্তু ব্যর্থ হন, মুহূর্তের মধ্যে সি পি এম জোনাল কমিটির নেতা সুধীর নস্করের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সি পি এম ঘাতক এলোপাথাড়ি গুলি চালায় কমরেড দিলীপের উপর এবং নিশ্চিন্ত হবার জন্য ঘাতকরা তাঁর গলা কেটে দেয়।

লজ্জার বিষয়, কুলতলি থানার পুলিশ হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের কোন চেষ্টাই করেনি। স্থানীয় মানুষ খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মৃতদেহ সরাতে বাধা দিলে পুলিশ তাঁদের উপর বলপ্রয়োগ করে, এমনকি জনৈকা মহিলার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দ্রুত মৃতদেহ নিয়ে স্থানীয় থানায় বা ক্যাম্পে না গিয়ে বারুইপুরে চলে যায়। মৃতদেহ সুরতহালের কোন ব্যবস্থাও তারা করেনি।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঐদিন রাত্রেই পৌঁছে যান স্থানীয় বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এবং জেলার নেতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। কুলতলি থানার পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে ক্যানিং সি আই-এর কাছে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আমরা আশঙ্কা করছি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর পরিকল্পনায় সি পি এম ঘাতকরা আরও বহু এস ইউ সি আই নেতা ও কর্মীদের হত্যা করার চেষ্টা করবে।

সি পি এম-এর এই হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী গুরুতর অসুস্থ

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত ১৮ মার্চ ২০০৩ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি হন। কমরেড ব্যানার্জী দুই ফুসফুসের সংক্রমণে (pneumonitis) আক্রান্ত হন এবং এখনও উদ্বেগজনক অবস্থায় আছেন।

কমরেড ব্যানার্জীর চিকিৎসার তদারক করছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একটি বোর্ড যার মধ্যে আছেন অধ্যাপক ডাঃ এন কে মজুমদার, অধ্যাপক ডাঃ এস সি দে, ডাঃ সঞ্জয় ঘোষ, ডাঃ সুনন্দ অধিকারী, ডাঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায় (কার্ডিওলজিস্ট), ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য (চেস্ট মেডিসিন) প্রমুখ।

বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক দলের প্রতি এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

(পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বের কাছে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ৩০ মার্চ নিম্নের চিঠি পাঠিয়েছেন।ং

প্রিয় কমরেড,

আমাদের মধ্যে নানা প্রশ্নে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশ ইরাকের উপর মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু যৌথ কর্মসূচিতে আমরা বিভিন্ন দল সামিল হয়েছি। আমরা এ পর্যন্ত কিছু কিছু জেলায় যুক্ত মিছিল, ২৫ মার্চ কলকাতায় এক যৌথ কনভেনশন, ছাত্র সংগঠনগুলির সম্মিলিত উদ্যোগে ছাত্র ধর্মঘট ও বুশ-ব্লেয়ারের কুশপুত্তলিকা দাহ — এইসব কর্মসূচি পালন করেছি। আজ ৩০ মার্চ যুক্ত উদ্যোগে কলকাতায় একটি মহামিছিল করছি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাকে দিনের পর দিন যে বর্বর ধ্বংসলীলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, এতে শুধু এই ধরনের কর্মসূচি যে যথেষ্ট নয়, এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয় আমাদের সাথে একমত হবেন। ভারতবর্ষের বিশেষত এ রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণে আছে। কিন্তু আজ যখন এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে খোদ মার্কিন দেশে ও ইংল্যাণ্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে ও প্রতিরোধ সংগঠিত করছে, যখন ইউরোপে এশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে প্রবল বিক্ষোভের জোয়ার বয়ে চলেছে, তখন দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের পূর্বতন ঐতিহ্য অনুযায়ী এই দেশে ও বিশেষভাবে এই রাজ্যে তেমন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারিনি।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বিরোধী ভাবাবেগের কোন মূল্য না দিয়ে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী তোষণ নীতি নিয়ে চলছে।

এই অবস্থায় আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে ঃ —

১। শুধু এ রাজ্যেই নয়, সর্বভারতীয় স্তরে সকল বাম এবং গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এমনভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে ভারত সরকার এই সাম্রাজ্যবাদী তোষণনীতি পরিত্যাগ করে আক্রমণকারী মার্কিন দেশ ও বৃটেনের সাথে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়।

২। কার্যকরী আর্থিক চাপ সৃষ্টির জন্য দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই দ্রব্য বয়কট করার জন্য জনগণকে আহবান দিতে হবে। ইউরোপে ইতিমধ্যে এই বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেও কিছু কিছু এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে বয়কট আন্দোলন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিতভাবে এই বয়কট আন্দোলন শুরু করে আমরা সমগ্র দেশে সম্প্রসারিত করতে পারি।

ইতিপূর্বে ২৬ মার্চ তারিখে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক উপরিউক্ত প্রস্তাব দুটি জানিয়ে সকল বাম ও গণতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উত্তর আসেনি। তাই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে পুনরায় এই প্রস্তাব রাখছি।

আমরা মনে করি, আজ যখন আমাদের দেশে জনগণ সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে এই বর্বর সাম্রাজ্যবাদী হামলা অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী তখন জনগণের এই আকাঙ্ক্ষা যথাযথ রূপ দিতে এবং সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করতে উপরিউক্ত কর্মসূচি দুটি রূপায়ণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আমরা অতি সত্বর আপনাদের ইতিবাচক সাড়া প্রত্যাশা করছি।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net